বিশেষ প্রতিবেদন

এনপিএ-২০১৫

শিক্ষার মহাপরিকল্পনা করছে আমলারা ■ শিক্ষাবিদরা জানে না কিছুই

সবই হচ্ছে গোপনে

কমিটি করার কথা ছিল প্রকাশ্যে, জনগণ এবং শিক্ষাবিদদের মতামত নিয়ে। কাজ হচ্ছে। কিন্তু জনগণ জানে না, জানে না শিক্ষাবিদরা। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কয়েকজন আমলা করছেন আগামী ১৫ বছরের শিক্ষা পরিকল্পনা গোপনে ...

অনুসন্ধান করেছেন **সাইফুল হাসান**

গোয়ালার দুধে পানি মেশানোর অঙ্কের সঙ্গে এদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ভালোভাবেই পরিচিত। পানি মেশালে ঘনত্ব কমে এবং দুধের পরিমাণ বাড়ে। এই অঙ্কটি ছাত্রছাত্রীদের কি কাজে আসে সেটা একটা প্রশ্ন বটে। শিশুরা পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে ভেজাল মেশানো ও চুরির পাঠ নেয়। এই ধরনের উদ্ভট অঙ্ক বা পাঠ্যক্রম শিশুদের চরিত্রে কতখানি প্রভাব ফেলে তা কেউ কখনও ভেবে দেখেছি বলে মনে হয় না। আগামীর ভবিষ্যৎ আজকের শিশু সুন্দর পরিবেশে বেড়ে উঠবে, সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে এটা আমরা সবাই চাই। এবং এজন্য অনেকেই অনেক রকমের কথা বলি। কিন্তু যে কথাগুলো বলি সেগুলো সম্ভবত বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করলে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের ভেজাল বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতাম না। রাষ্ট্র সবার জন্যে শিক্ষার কথা বলে। এক সময় এই স্লোগানটি ছিল, '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা।' এই স্লোগানের কথা আমরা ভুলে গেছি। এখন বলছি '২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'। কেন ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম কার্যকর হলো না– সেটা রাষ্ট্র খতিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করলো না।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, সম্পন্ন বাংলাদেশ, আলোকিত বাংলাদেশ– আমরা এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন এটি শিক্ষিত জাতি। শিক্ষিত জাতি পেতে হলে প্রয়োজন একটি নীতিমালা। যা পরিচিত শিক্ষানীতি হিসেবে। এমন একটি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রয়োজন, যেখানে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হবে প্রাথমিক শিক্ষায়। একটি শিশু যদি ছোটবেলা থেকে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ পায়, স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে শিক্ষা বিষয়টি ভীতিকর হয়ে উঠবে না। শিক্ষা যখন আনন্দের হয়, তখন ঘটে মৌলিক চিন্তার বিকাশ। কিন্তু প্রায় ৩১ বছর বয়সী বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত এমন একটি শিক্ষানীতি পেল না। শিশুদের জন্যে শিক্ষা যে আনন্দের– এই চিন্তাটাই কেউ করলো না। জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেকগুলো শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। এরমধ্যে কুদরত-ই-খুদার শিক্ষানীতি একমাত্র যুগোপযোগী হিসেবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু সেই শিক্ষানীতিকেও বাস্তবে প্রয়োগ করেনি কোনো সরকার।

ব্রিটিশ শাসনামলে লর্ড মেক্‌লে নামক একজন ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ভারতীয়দের জন্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য শিক্ষিত মানুষ তৈরি করা ছিল না। ছিল ব্রিটিশ শাসনকে সহযোগিতা করার জন্য ভারতীয়দের মধ্য থেকে কেরানি তৈরি করা। ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসন শেষ হয়েছে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি। ভারত ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে ভারতীয় হয়েছে। আর বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত লর্ড মেক্‌লের শিক্ষানীতির ধারণার বাইরে আসতে পারেনি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অনেকগুলো সরকার এসেছে। কিন্তু কোনো সরকারই আজ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারেনি। শিশুদের জন্য একটি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যন্ত প্রণয়ন করতে পারেনি। ফলে সেই মান্ধাতা আমলের, সময়ের অনুপোযোগী প্রাথমিক শিক্ষার ওপরই এদেশের শিশুদের নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে শিশুরা পাঠ্যক্রমে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে, ক্লাসে ঝরে পড়ার হার বাড়ছে, দেশ বঞ্চিত হচ্ছে বিশাল শিক্ষিত এক জনগোষ্ঠী থেকে। যদিও দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। কমিশনগুলো রিপোর্ট তৈরি করেছে। বাস্তবতার সঙ্গে সেগুলোর সংযোগ ছিল না। ছিল না যুগোপযোগীও। এমন কী কার্যকরী হয়নি কোনোটাই। শুধুমাত্র জনগণের টাকা অপচয় হয়েছে। কমিশনের রিপোর্ট ভালো ছিল কি খারাপ ছিল তারচেয়ে বড় কথা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অভাবে একটি রিপোর্টকেও কাজে লাগানো যায়নি। ফলে বাংলাদেশের শিশুরা এক ধরনের ধোঁয়াটে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। যা শিশুদের চরিত্র তৈরিতে সাহায্য করেনি বরং ব্যাপক অর্থে শুধু মেধার অপচয় ঘটেছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা শিক্ষা দেন বা নেন তাদের যদি প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশ কোন শিক্ষানীতি অনুযায়ী চলছে? ধারণাগতভাবে উত্তর হলো অধিকাংশই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। কারণ বিভিন্ন সময়ে কমিশন করা হলেও কোনো শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টই সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। যে কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক কি ধরনের শিক্ষানীতি মেনে চলে সেটাও বড় একটা প্রশ্নবোধক বিষয়।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্যা জর্জরিত, ধোঁয়াটে এবং বহু ভাগে বিভক্ত। এরমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। আর্থিক ও সামাজিক বলয়ে বিত্ত ও বিত্তহীনতা প্রাথমিক শিক্ষাকে ভাগ করে ফেলেছে। সাধারণ শিক্ষা যেটা সারা দেশের গ্রামবাংলায় শিশুরা নেয়, এটা প্রাথমিক শিক্ষার একটা দিক। এই ধারণার বাইরেও আরও অনেকগুলো প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো বাংলাদেশে রয়েছে। প্রত্যেকটি ধারণায় পৃথক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংঘাতপূর্ণও বটে। বলা যায়, যে শিশু মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা নিচ্ছে তার সঙ্গে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেনের অসামঞ্জস্য অনেক। মাদ্রাসা

শিক্ষায়ও আবার দু'তিন ধরনের প্রাথমিক পাঠ দেয়া হয়। এর বাইরে ইংরেজি মাধ্যম ও বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও রয়েছে আলাদা আলাদা পাঠক্রম। অন্যদিকে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে এক ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা রয়েছে। এটা মূলত বয়স্ক মানুষদের জন্য। আবার দেশের ব্যাপক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত বা প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার জন্য রয়েছে এনজিওদের শিক্ষা কার্যক্রম। এনজিওগুলো মূলত প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। শিক্ষাবিদদের মতে, একটি দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে। ফলে শিক্ষার যে উদ্দেশ্য সেটাই অধিকাংশ সময় ব্যাহত হয়। এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় শিক্ষার যে লক্ষ্য থাকে সেটা কখনোই পূরণ হয় না। যেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হয় না সে কারণে প্রাথমিক শিক্ষার বিভক্তিগুলো আরও বাড়তেই থাকে। বিভক্তি বেড়ে যাওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা মৌলিক শিক্ষা থাকে না, ব্যাপারটা অনেকটা চাপিয়ে দেয়ার মতো হয়ে যায়। এর সঙ্গে অবশ্য আরও বহুবিধ বিষয় জড়িত। যেমন পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যবিষয়, শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের সঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলোও জড়িত। বিগত ৩০ বছরে প্রাথমিক শিক্ষার এসকল সমস্যা নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা হলেও এগুলো কোনো কাঠামোগত রূপ পায়নি। সমস্যাগুলো এখন পর্যন্ত সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

> 'আমি জানি না। আমি এখনও অ্যাকশন প্ল্যান দেখিনি। এনপিএ তৈরি হচ্ছে কিনা, হলে কীভাবে তৈরি হচ্ছে, কারা তৈরি করছে, সত্যিই আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না।'
>
> **অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা**
> সাবেক ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছড়িয়ে দাও শিক্ষার আলো

নিরক্ষর জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের কাছে বোঝা স্বরূপ। যে দেশে নিরক্ষর মানুষ যত বেশি সে দেশে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক অনাচারও বেশি। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলোর খারাপ অবস্থার মূলে রয়েছে শিক্ষার অভাব। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে হয়তো বাংলাদেশের মত বহুবিধ শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বহু ধারণা থাকার পরও গত এক দশকে দেশে প্রচুর পরিমাণ স্কুল কলেজের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও বেড়েছে। অবশ্য ক্লাসে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার হারটাও আশঙ্কাজনক। '৯০-এর দশকের শুরু থেকেই বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার ব্যাপারে একটা চাপ বাড়ছিল। বিশ্বব্যাংকসহ দাতা সংস্থাগুলোরও বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এমনকি এরশাদ সরকারের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিবছর বাজেটে সামরিক ব্যয় যা রাখা হত তার তুলনায় শিক্ষা বাজেট ছিল কম। '৯০-এর দশকে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাসহ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সাক্ষর করে। এর মধ্যে নারী শিক্ষা প্রধান হলেও আলোচ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষা। দেশে সাক্ষরতার হার বাড়ানোসহ ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নেয়া হয়। দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ কাজে হাত বাড়িয়ে দেয় ইউনেস্কো, বিশ্বব্যাংকসহ দাতা সংস্থা ও সাহায্যকারী দেশগুলো। অন্যদিকে দেশে শুধুমাত্র সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্য সরকার সহ বিভিন্ন সংগঠন শিক্ষার কর্মসূচি হাতে নেয়। '৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে দেশে শিক্ষার ব্যাপারে একটা তোড়জোড় লক্ষ্য করা যায়। এই স্রোতটা অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষা কাজেই ব্যবহৃত হয়। '৯০-এর দশকে শহরের মত গ্রামাঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণ বিদ্যালয় গড়ে উঠতে দেখা যায়। এর পেছনের প্রধান লক্ষ্য শিক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবতা ভিন্ন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সরকারের একজন সচিবের মতে, 'দশ পনেরো বছরে যে হারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে সে অনুপাতে সফল শিক্ষার্থী তৈরি হয়নি। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার পেছনের কারণ হচ্ছে সরকারি অধিভুক্ত হওয়া। এলাকায় গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ৫ জন শিক্ষককে চাকরি দিয়েছে বিনিময়ে ন্যূনতম ৫০ হাজার করে টাকা নিয়েছে। সরকারি অধিভুক্ত হওয়ার পর সরকারি সাহায্য তো আছেই। এরপর খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা। এর গমও যায় স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কাছে। তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াল? তারপরও ভালো হয়েছে যে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে। সেখানে যাই শিখুক কিছু একটা তো শিখছে। হয়তো সেটা মানসম্পন্ন শিক্ষা নয়— তারপর পড়তে লিখতে শিখছে এটাকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। এতে আর যাই হোক শিক্ষা কর্মসূচির যে লক্ষ্য ছিল তা এগিয়ে নিতে অনেক সহায়তা হয়েছিল।'

৯০-এর দশকে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বে শিক্ষার আন্দোলন বেশ জোরে সোরে শুরু হয়। ১৯৯০ সালের মার্চে 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক এক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে। এই সম্মেলনে ১৬০টি দেশের সরকারি প্রতিনিধি এবং ১৫৫টি দেশ থেকে বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা যোগ দেয়। এই সম্মেলনে বলা হয়, শিক্ষা মানুষের ৫টি মৌলিক অধিকারের একটি। বিশ্বের প্রতিটি মানুষের শিক্ষার অধিকার রয়েছে। এই সম্মেলনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়। সেটি হলো প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিরা দেশে ফিরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় একটি পরিকল্পনা নেবে। এই পরিকল্পনা এমনভাবে নিতে হবে যার কৌশল ও লক্ষ্য এমন হবে যাতে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জমতিয়েন সম্মেলন সনদে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। এই সম্মেলনের পর বিশ্বব্যাপী শিক্ষা বিষয়ে খুবই আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারি বেশ কিছু কর্মসূচি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর ব্যাপকভাবে জোর দেয়া হয়। এর ফলও মেলে। ১৯৯০ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিশ্বের ১২ কোটি ৭০ লাখ শিশুর শিক্ষার সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততাই ছিল না। ৯৬ কোটি বয়স্ক নিরক্ষর লোক ছিল। এই হিসাবে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের মোট ১ কোটি ৭০ লাখ শিশুর মধ্যে ১ কোটি ২০ লাখ শিশু প্রাইমারী স্কুলগুলোতে তালিকাভুক্ত ছিল। ১৯৯৫ সালের অন্য আরেকটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় এই শিশুদের মাত্র ৪০ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছিল। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়েছিল ৬০ শতাংশ। সে সময় বয়স্ক নিরক্ষর জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটির ওপর। জমতিয়েন সম্মেলনের পর বাংলাদেশ দ্রুত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সে সময় সরকারিভাবে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য লক্ষ্য ধরা হয় ২০০০ সাল। এই লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে সরকারিভাবে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে একটি ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশনও তৈরি হয়। প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা নেয়া হয়। এসব পরিকল্পনায় সরকারি প্রতিনিধিদের বাইরে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল। ফলে কোনো কোনো জেলায় নিরক্ষর মুক্ত করার আন্দোলন গতি পায়। এ সময়ে নিরক্ষর জনগোষ্ঠী ও শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ পরের দিকে প্রায় থমকে দাঁড়ায়।

ফলে সরকারের সবার জন্য শিক্ষা-২০০০ কর্মসূচি ব্যর্থ হয়। সরকারিভাবে এখন দাবি করা হয় দেশে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশ। বাস্তবতা হচ্ছে এই সংখ্যা অনেক কম। কারও কারও মতে কোনোভাবেই এই হার ৪০ শতাংশের বেশি নয়। '৯০-এর গোড়ার দিকে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার যে আগ্রহ সবার মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল পরবর্তীতে তা থেমে গেলো কেনো কিংবা 'সবার জন্য শিক্ষা-২০০০' কর্মসূচি কেন ব্যর্থ হলো সেটা অনুসন্ধানের বিষয়। যদিও এসব কর্মসূচির জন্য বা পরিকল্পনার জন্য বিদেশী অর্থ এসেছে, ইউনেস্কো, বিশ্বব্যাংক, ইউনিসেফ, ইউএনডিপির গাইড লাইন ছিল।

সবার জন্য শিক্ষা, ডাকার সম্মেলন এবং বাংলাদেশ

যে কোনো বিষয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হলে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা আন্তরিক হলে সে কাজটি হতে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ পরিবার পরিকল্পনার কথা বলা যায়। বাংলাদেশের মত রক্ষণশীল দেশে এই কাজটি বহুলাংশে সফল। এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়- ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরের রাজনীতিবিদ, দেশের জনগণের অংশগ্রহণ, ব্যাপক প্রচার এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের দায়িত্বপ্রাপ্তদের কঠোর পরিশ্রম অন্যতম কারণ। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটো মন্ত্রণালয়, হাজার হাজার কর্মচারী, লাখ লাখ শিক্ষক ও হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার পরও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এর পেছনে দুর্নীতি, সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা, গোপনীয়তা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ অনেক কারণ রয়েছে। শিক্ষা যেহেতু জনগণের মৌলিক অধিকার সেহেতু রাষ্ট্র তথা সরকার জনগণকে মৌলিক শিক্ষাটা দিতে বাধ্য। কিন্তু জটিল আমলাতন্ত্র নির্ভর রাষ্ট্র কাঠামো শিক্ষা বিস্তারের জন্য কাজের কাজ কিছু করতে পারেনি। একটা পর্যায়ে শিশুদের স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। কিন্তু সেটাকে ধরে রাখা যায়নি। আবার ব্র্যাকের মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্কুলগুলোর সাফল্য লক্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। ব্র্যাক স্কুলের সুন্দর ভবন নেই কিন্তু শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার খুবই ভালো এবং ঝরে পড়ার হার ৫ শতাংশেরও কম। জমতিয়েন সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব শিক্ষা ফোরামের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তারা সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জমতিয়েন সম্মেলনের এক দশক পর সেনেগালের রাজধানী ডাকারে বিশ্ব শিক্ষা সংস্থার আসর বসে। এই সম্মেলন থেকে 'সবার জন্য শিক্ষা' ২০১৫ সালের মধ্যে নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়। ডাকার সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম ঘোষণা করে, 'আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই কোনো রাষ্ট্রই সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল না। অবশ্য সম্পদের অভাবের কারণেও এই কর্মসূচি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। যদিও প্রত্যেকের সবার জন্য শিক্ষা'র একটি জাতীয় ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা করার কথা ছিল। এ বিষয়ে তারা দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে আজকে ডাকার সামিটে অংশগ্রহণকারীরা চাচ্ছে প্রচুর পরিমাণ তথ্য। যেটা স্রেফই তথ্য ছাড়া আর কিছু নয়। মোটের ওপর বিশ্বব্যাপী প্রচুর পরিমাণ অভিজ্ঞতা ও কাগুজে পরিকল্পনা রয়েছে যা কখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি এবং ভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হয় না। এবং কিছু বিষয় আছে যা আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না...।'

ডাকার সম্মেলন শেষে দেশে ফিরে সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশন (এনপিএ) করার কথা। এই এনপিএ কিভাবে করা হবে সে ব্যাপারে একটি গাইড লাইনও ইউনেস্কো তৈরি করে দেয়। ডাকার সম্মেলন অনুযায়ী জাতীয় প্ল্যান অব অ্যাকশনের ক্ষেত্রে ৬টি শর্তের কথা বলা হয়। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান শর্ত হিসেবে বলা হয়, 'এনপিএ হবে সরকারের সরাসরি নেতৃত্বে এবং তা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুশীল সমাজের সঙ্গে পরামর্শ করে।'

ডাকার সম্মেলন হয়েছে ২ বছরেরও বেশি। বাংলাদেশ সেখান থেকে ফিরে সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক একটি এনপিএ তৈরি করছে বলে গোপনসূত্রে জানা যায়।

এনপিএ এবং গোপনীয়তা

অদ্ভুত ব্যাপার হলেও কথাটা সত্যি যে এনপিএ বিষয়ে সরকার কঠোর গোপনীয় পন্থা অনুসরণ করছে। একটি দেশের মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা হচ্ছে অথচ এ বিষয়ে কেউই কিছু জানে না। কেউই কিছু জানে না প্রসঙ্গ আসছে এই কারণে যে, যাদের জানার কথা তারা কেউই কিছু জানে না। একটি দেশের শিক্ষা পরিকল্পনা হবে, সেটা সবার আগে জানার কথা, যারা শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিত তাদের। কিন্তু

প্রাথমিক শিক্ষা কী

প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে মৌলিক শিক্ষা। যে শিক্ষার মাধ্যমে একটি শিশু ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হয়ে বেড়ে উঠবে। এটা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আরও সহজভাবে বললে একটি শিশুর মানবিক গুণাবলী ও চরিত্র গঠনের শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে। যে কারণে যে কোনো জাতির জন্য জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ১৯৯৭ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার অনন্য ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা। দেশের উন্নতির লক্ষ্যে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য। বর্তমান বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান মোটেই সন্তোষজনক নয়। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ, শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতূহল, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, সদাচার, ন্যায় নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করতে সহায়তা করা হয়।

একই রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হবে শিশুদের ব্যবহারিক সাক্ষরতা সুদৃঢ় করা। এই স্তরের শিক্ষাকাল শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবেগিক-নৈতিক-গঠন ও অর্থপূর্ণ কায়িক শ্রমের প্রস্তুতি গ্রহণেরও সময়। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে শিশুকে পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে তোলে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পরবর্তী কালের জীবনভর শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করে। কাজেই এই স্তরের শিক্ষা, যা আজকাল মৌলিক শিক্ষা বলে গণ্য তা প্রতিটি শিশুর আনন্দময় বর্তমান ও উৎপাদনশীল ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদি বা মৌলিক শিক্ষা যাই বলা হোক না কেন বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক কাঠামোই গড়ে ওঠেনি। এটা শুধু পাঠ্যক্রমগতভাবেই নয়। শিক্ষক সমস্যা, আবাসন সমস্যা, বই-খাতা, রাজনৈতিক সমস্যাও বটে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে, মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা খরচ করে সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম হয়েছে, হয়েছে বই কেলেঙ্কারি। প্রাথমিক শিক্ষা কি এই ধারণাটিকেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। অথচ প্রাথমিক শিক্ষার একটি মোটামুটি শক্ত অবস্থান অনেক কাল আগে থেকেই ছিল। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে যারা কাজ করেছেন বা করছেন তারা সবসময়ই অজ্ঞাত কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়মনীতি প্রণয়নের কাজ থেকে দূরে থেকেছেন বা তাদের দূরে রাখা হয়েছে। ফলে শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার সুস্পষ্ট ধারণা সম্পর্কে দেশের মানুষ দূরে অবস্থান করেছে। এই দূরত্ব কমেনি বরং দিন দিন বেড়েছে।

তারা কেউই প্রায় কিছু জানে না। বিস্ময়কর হলেও এটাই সত্যি। বিষয়টি জানে না রাজনীতিবিদরাও। সাধারণ জনগণের কথা আলোচনায় না আনাই ভালো। কারণ তাদের কথা কেউই চিন্তা করে না। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা হবে এটা নিয়ে দেশব্যাপী হৈ চৈ হওয়ার কথা, অথচ বাস্তবে ঘটছে তার উল্টো। প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই গোপনীয়তা? যদিও ডাকার সম্মেলনের ঘোষণায় এনপিএ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এনপিএতে সরকারের পাশাপাশি অবশ্যই সুশীল সমাজের মতামত নিতে হবে। সুশীল সমাজ বলতে এখানে যে শিক্ষাবিদদের বোঝানো হচ্ছে সেটা তো পরিষ্কার করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। সবচেয়ে বড় কথা ডাকার সম্মেলনে কখনোই বলা হয়নি যে এনপিএ গোপনে করতে হবে, শিক্ষাবিদ বা জনগণকে না জানিয়ে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে সরকারের নেতৃত্বে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এনপিএ তৈরি করতে হবে।

'সবার জন্য শিক্ষা-২০১৫' শীর্ষক একটা জাতীয় অ্যাকশন প্ল্যানের এই কাজ কেন গোপনে করা হচ্ছে এ বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করেছি। আদৌ কাজ হচ্ছে কিনা, হলে কারা করছে- জানার জন্য বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান করতে হয়েছে আমাদের। মজার বিষয় হলো এনপিএ তৈরির জন্য গঠিত কমিটির সঙ্গে জড়িত অনেককে প্রশ্ন করলেও তারা এনপিএ বিষয় এড়িয়ে অন্য বিষয়ে কথা বলতে চান। কিংবা অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। এই 'অন্য কেউ' আবার 'অন্য কারো' সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। কিন্তু এ বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব কারো কাছ থেকেই পাওয়া যায়নি।

প্রথমেই আমরা যোগাযোগ করি শিক্ষাবিদদের সঙ্গে। বাংলাদেশের শিক্ষাবিদদের আবার দু'তিন রকমের পরিচিতি রয়েছে। কেউ আওয়ামী শিক্ষাবিদ, কেউ বাম-আওয়ামী শিক্ষাবিদ আবার কেউ পরিচিত বিএনপি শিক্ষাবিদ হিসেবে। বিএনপি'র নেতৃত্বে জোট সরকার ক্ষমতায়। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা হয় বিএনপি শিক্ষাবিদদেরই এনপিএ-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কথা। আমরা প্রথমেই যোগাযোগ করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. এমাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে। তিনি বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিত।

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এনপিএ তৈরি হবে এটা আমি জানতাম। কিন্তু কীভাবে তৈরি হচ্ছে বা কবে নাগাদ তৈরি হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানি না।'

> 'প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে না কি? আমি তো কিছু জানি না। কিভাবে হচ্ছে? কারা করছে?'
>
> **অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী**
> শিক্ষাবিদ

খসড়া রিপোর্ট তো তৈরি হয়ে গেছে।

'আমি জানি না রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেছে কিনা।'

এনপিএ তৈরি হওয়া প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপনি সম্পৃক্ত ছিলেন?

'না আমি সম্পৃক্ত ছিলাম না।'

এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি হলেন না এমাজউদ্দিন আহমেদ। পরে কথা বলবো, মাঠ পর্যায়ে কাজ চলছে প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কথা বলে মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন।

বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা। এনপিএ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি পুরোপুরি অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, 'আমি জানি না। আমি এখনও অ্যাকশন প্ল্যান দেখিনি। এনপিএ তৈরি হচ্ছে কিনা, হলে কীভাবে তৈরি হচ্ছে, কারা তৈরি করছে, সত্যিই আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না।'

প্রগতিশীল বা বাম বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শিক্ষাবিদ হিসেবে তার পরিচিতি সর্বজনবিদিত। দেশের সবকয়টি শিক্ষা-সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছে তার সম্পৃক্ততা। অথচ এনপিএ সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি। এনপিএ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে না কি? আমি তো কিছু জানি না। কিভাবে হচ্ছে? কারা করছে?' এই প্রশ্নগুলোও করেন তিনি।

শিক্ষাবিদদের বাইরে রেখে শিক্ষা প্ল্যান করলে সেটা কতটা ভালো হবে বলে মনে করেন? উত্তরে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'কিভাবে তৈরি হচ্ছে, কারা তৈরি করছে সেটা না জেনে কিছু বলা ঠিক নয়। তবে শিক্ষানীতি তৈরি হবে আর শিক্ষাবিদরা জানবেন না সেটা তো হওয়া উচিত নয়। আমি এ বিষয়ে জানি না এটাই সত্যি।'

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক নূরউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'ডাকার সম্মেলন ও সেখানকার ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে জানি। তবে এনপিএ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। এখন সেটা কি অবস্থায় আছে জানি না। কেউ এনপিএ সম্পর্কে আমাকে কিছু জানায়নি, মতামতও নেয়নি।'

অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, 'ডাকার সম্মেলন সম্পর্কে জানি। সবার জন্য শিক্ষা ২০১৫ শীর্ষক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে এরকম কোনো খবর আমার জানা নেই।'

অধ্যাপক শামসুল হক আমাদের প্রশ্ন করেন, 'সত্যিই চলছে নাকি?'

এনপিএ'র জন্য ইউনেস্কোর গাইড লাইন, শিক্ষাবিদদের অনুপস্থিতি, আমলাতান্ত্রিক গোপনীয়তা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক শামসুল হক বলেন,' সরকার যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে কাজ করাতে পারে। আমাকে কেউ ডাকেনি। আমি বিগত সরকারের সময় জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম। আমরা একটা রিপোর্ট দিলাম ২ বছর খেটে। কিন্তু লাভ হলো কি? আমি মনে করি মন্ত্রণালয়ের উচিত ছিল ইউনেস্কোর গাইড লাইন অনুযায়ী শিক্ষাবিদদের দিয়ে একটা খসড়া তৈরি করে নেয়া। তা কেন করলেন না এটা তো সংশ্লিষ্টরাই বলতে পারবেন।'

বাংলাদেশের আরেকজন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, 'এনপিএ সম্পর্কে কিছু জানি না । যদিও একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আমার নিজেরই জানা থাকা উচিত ছিল। মন্ত্রণালয় হয়ত প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের জানিয়েছিল।'

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তারাও বিষয়টি জানেন না জানালে, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নীতি হবে আর প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা জানবে না এটা কেমন কথা! এটা তো হওয়া উচিত নয়। এভাবে একটি শিক্ষা পরিকল্পনা হলে সেটা তো কোনো কাজে আসবে না।'

আপনি কি জানেন এনপিএ তৈরি করছে আমলারা? অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, 'বিষয়টি হচ্ছে শিক্ষা এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের। আমলারা কীভাবে ভালো একটি শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না।'

অধ্যাপক জাহেদা বেগম প্রাইমারি শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি পিএইচডি করেছেন বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। এনপিএ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এরকম একটা প্ল্যান হচ্ছে শুনেছি। এর বেশি কিছু আমি জানি না। এনপিএ কারা তৈরি করছে, কীভাবে তৈরি করছে কিছুই আমি জানি না। আসলে সরকার যদি আমাদের না ডাকে তাহলে তো আমাদের সেখানে যাওয়ার সুযোগ নেই। প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আমি অনেক কাজ করেছি। এ বিষয়ে আমার গবেষণা আছে কিন্তু এনপিএ যারা তৈরি করছে তারা আমার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। আমাকে ডাকেনি বলে বলছি

না। আমি মনে করি এনপিএ'র মতো বড় একটি কাজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের সম্পৃক্ত করা উচিত। গবেষকদেরও ডাকা উচিত। কিন্তু কোনো সরকারই এসব কথা মাথায় রাখে না। সব জায়গায় সরকার নিজেদের লোক রাখে। পিয়ন থেকে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সরকারি দলের লোক হতে হবে। আন্তর্জাতিক গাইড লাইনও মানা হয় না। আমলারাও হয়ত তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলেই ইউনেস্কোর গাইড লাইন মানছে না।'

শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত? প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা এলে এই প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে আসে। বুয়েটের উপাচার্য ড. নূরউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্বাস্থ্যগত অবকাঠামো নেই। এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণও কম। আমি মনে করি প্রাথমিক শিক্ষাটাই একজন শিক্ষার্থীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে হবে। যাতে শিশুরা পাঠক্রমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিষয়টা যেন এমন হয়- একটি শিশু খেলতে খেলতে তার পাঠ নিতে পারে। আজকে ব্র্যাকের স্কুলে সাকসেস রেট হাই। কিন্তু কেন? প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা পারছে না কেন সফল হতে? খোঁজ নিয়ে দেখেন, মূল ব্যাপার হলো কারিকুলাম। ব্র্যাকের বই অনেক আকর্ষণীয়। পাশাপাশি শিক্ষার উপকরণ আরও সহজলভ্য করে তুলতে হবে। গবেষণা করে দেখা প্রয়োজন কারিকুলামকে সহজ এবং আকর্ষণীয় করা যায় কিভাবে। শিক্ষকদের মান বাড়াতে হবে। উন্নততর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যা বললাম এসব ঠিকমতো করতে পারলেই কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।'

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে খুব সহজভাবে বলা যায়, যারা আজকে প্রাথমিক শিক্ষার অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করছে, তাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিও শিক্ষার সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষাক্রমে ধর্ম ও বর্ণ উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। যাতে একটি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে তার মানবিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে। যা তার ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। আমি মনে করি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ। আর আমলাদের দৃষ্টিভঙ্গিই তো আলাদা। তারা প্রাথমিক শিক্ষা আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টি থেকে দেখবে এটাই স্বাভাবিক।'

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সাবেক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, 'আমলারা কি শিক্ষানীতি তৈরি করে? এমন কিছু কি শুনেছেন কোনোদিন? না পৃথিবীর কোথায়ও ঘটেছে এমন? আমলাদের চরিত্রই হলো এক লাইন ছেড়ে অন্য লাইনে যাওয়া। প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম কথা হল শিক্ষা কি? সহজ পাঠে মাতৃভাষায় সহজবোধ্য শিক্ষা কারিকুলাম করতে হবে। যে শিক্ষায় মানুষের নৈতিকতা বোধ তৈরির ব্যাপার থাকবে। আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে নৈতিকতা বোধসম্পন্ন মানুষ থেকে আমরা বঞ্চিত হই। প্রাথমিক শিক্ষা হতে হবে আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থা ও চরিত্র বোধের ওপর ভিত্তি করে।'

শিক্ষাবিদ প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, ' প্রাইমারি শিক্ষা মৌলিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা নিতে হলে সমাজের কিছু মানুষ যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন, শিক্ষাবিদ হিসেবে যারা পরিচিত, তাদের মতামতের প্রতিফলন থাকতে হবে। আবার সকলের মতামত প্রতিফলিত হয় কিনা সেটাও দেখার ব্যাপার। তবে আমি মনে করি, পলিসি তৈরিতে সব ধরনের মানুষের অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন।'

শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও সার্বজনীন হওয়া উচিত। এ কথাটা আগেও আমি বলেছি। মাতৃভাষা ও অঙ্ক দেশের ইতিহাস ও কিছুটা ভূগোল প্রাথমিক শিক্ষায় থাকতে হবে। দ্বিতীয় ভাষা নিয়ে বিতর্ক আছে। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি একদম প্রথম থেকে শুরু করলে তার জন্য মানসম্মত শিক্ষক খুঁজে বের করতে হবে। এখন যারা প্রাথমিক শিক্ষা দিচ্ছে তারা তো ঠিকমতো শুদ্ধ বাংলাই জানে না। তাদের কাছ থেকে ভালো ইংরেজি আশা করা যায় না।'

> 'ডাকার সম্মেলন সম্পর্কে জানি। সবার জন্য শিক্ষা ২০১৫ শীর্ষক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে এরকম কোনো খবর আমার জানা নেই।'
>
> **অধ্যাপক শামসুল হক**
> প্রাক্তন চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি

এনপিএ'র জন্য যারা থিম পেপার লিখেছিলেন

১. মমতাজ জাহান– ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট, সাবেক কলেজ শিক্ষক
২. মাহামুদুল আলম– সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, হিউম্যান রিসোর্স ডিভিশন, বিআইডিএস
৩. প্রফেসর মুত্তাকী– অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. নূরুল ইসলাম খান– ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা
৫. ড. মোঃ ইব্রাহীম– অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬. রওশন জাহান– ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট
৭. হাবিবুর রহমান– সেভ দ্য চিলড্রেন ইউএসএ কর্মকর্তা
৮. নাম জানা যায়নি

এনপিএ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা কথা বলেছি দেশের প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, হিসেবে যারা পরিচিত তাদের সঙ্গে। এরকম আরও অনেক শিক্ষাবিদের সঙ্গে কথা হয় আমাদের। অনেকেই অনেক রকম মতামত দিয়েছেন। এসব মতামতকে এনপিএ তৈরির কাজে লাগালে মানসম্মত যে প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে, সেটা আরও ভালো হতো বলেই সব মহলের ধারণা। কিন্তু এসব শিক্ষাবিদদের মতামত নেয়া তো দূরে থাক এনপিও সম্পর্কে তাদের কিছু জানানোর প্রয়োজনই মনে করেনি আমলা নিয়ন্ত্রিত কমিটি।

শিক্ষানীতি যাদের প্রণয়ন করার কথা সেই শিক্ষাবিদরা এনপিএ বিষয়ে কিছু জানেন না সেটা বোঝা গেল। তাহলে প্রশ্ন আসে জানেন কারা? এনপিএ তৈরি করছে কারা? এ বিষয়ে জানার জন্যে আমরা যোগাযোগ করি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা এএফএম আমিনুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি কিছু জানেন না। তবে তিনি বিএনসিইউ বা বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। বিএনসিইউ'র ড. মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'এনপিএ'র কাজটা আমরা করছি। ইউনেস্কো অন্যান্য অনেক প্রোগ্রাম আমাদের মাধ্যমে করে। আপনি পিএমইডিতে ড. তাহমিনা হোসেন ও ড. দেলোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারাই এটা করছেন।'

এরপর যোগাযোগ করা হয় ড. দেলোয়ারের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ আমরা করছি কাজটা। ডাকার সামিটে সবাই কমিটমেন্ট করেছে। প্রত্যেকেরই দেশে ফিরে একটা এনপিএ করার কথা। এ জন্য ইউনেস্কো আমাদের টেকনিক্যাল ও সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্যও দিচ্ছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এনপিএ হবে। এ জন্য আমরা কিছু সেমিনার ও কর্মশালা করেছি। একটা খসড়া ডকুমেন্ট তৈরি হয়েছে। একজনকে আমরা লিখতে দিয়েছিলাম, সে লিখেছে। এখন এটা চূড়ান্ত

করার কাজ চলছে।'

এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলার জন্য ড. দেলোয়ার কোনোভাবেই সময় দিতে রাজি হননি। তিনি পিএসইডি'র সচিব ড. তাহমিনা হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। যোগাযোগ করা হয় ডা. তাহমিনা হোসেনের অফিসে। পরপর ৫ দিন যোগাযোগ করেও তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। সর্বশেষবার তিনি দিনাজপুর গেছেন বলে জানা যায়। এক পর্যায়ে ডা. তাহমিনা হোসেনের পিএস মোশাররফ হোসেন পরামর্শ দেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক ফজলুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। অনেক চেষ্টার পর ফজলুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়। এর আগে অবশ্য মোশাররফ হোসেন জানান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরই এনপিএ'র সঠিক জায়গা। তারা সবকিছু জানে এবং বলতে পারবে।

ফজলুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি আকাশ থেকে পড়েন। তিনি বলেন, 'আমরা জানবো কীভাবে? এই সংক্রান্ত কোনো কাজই আমাদের নেই। মাঝে মাঝে মিটিংয়ে ডাকলে আমরা যাই। দু'একটা কর্মশালায়ও গেছি ব্যস এ পর্যন্তই।'

তিনি ফজলুর রহমানও ড. দেলোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। এরপর আবার যোগাযোগ করা হয় মোশাররফ হোসেনের সঙ্গে। এবার মোশাররফ হোসেন বলেন, 'এই বিষয়ে যিনি দায়িত্বে আছেন, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিশনের সঙ্গে কাজ করছেন। তিনি ফ্রি হলে আপনাকে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব। তিনি ইএফএ ডেস্ক দেখছেন। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রীনা পারভীন নামক একজন সিনিয়র সহকারী সচিব ইএফএ/এনপিএ ডেস্কের দায়িত্বে আছেন।

এরপর আবার ডা. তাহমিনা এবং রিনা পারভিনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। একনাগাড়ে ১২ দিন চেষ্টার পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ড. তাহমিনা হোসেনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। তিনি বলেন, 'এনপিএতে শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণ খুবই কম, কথাটা ঠিক নয়। এনপিএ এখনো তো লেখাই হয়নি। লেখা হলে তারপর আমরা সব শিক্ষাবিদদের ডেকে কথা বলব। সবাই জানে না কথাটাও ঠিক নয়।' এ বিষয়ে তিনি আর কোনো কথা বলতে রাজি হলেন না। একই বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব ও এনপিএ তৈরির প্রধান ব্যক্তি রিনা পারভিনের সঙ্গেও অনেক কষ্টে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। রিনা পারভিন বলেন, 'আমি আপনাকে বলতে পারি আমরা এখন এনপিএ-এর চূড়ান্ত পর্যায়ে আছি। কিছুদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত ড্রাফট হয়ে যাবে। এটা আজকের ঘটনা নয়, অনেকদিন থেকে আমরা এ কাজটি করে আসছি। এনপিএ তৈরির কাজে মূলত শিক্ষাবিদরাই আছেন। তাদেরকেই আমরা নিয়েছি। শিক্ষাবিদরা জানে না বা জনগণের অংশগ্রহণ নেই কথাটা ঠিক নয়।' পরে কথা বলবেন বলে তিনি ফোন রেখে দেন।

এভাবেই এনপিএ সম্পর্কে জানার জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটতে হয়েছে। বোঝা যায় পুরো প্রক্রিয়ার মনে রয়েছে একটি 'স্বচ্ছ' 'অসচ্ছতা'। যে কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনোভাবেই কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। আমাদের এই ছোটাছুটি দেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা মন্তব্য করেন, 'বিষয়টি নিয়ে এতো লুকোচুরির কি আছে বুঝলাম না। একটা শিক্ষা পরিকল্পনা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এটা তো খুশির খবর। সকলের অংশগ্রহণে এটা আরও সফল হবে। অবশ্য আমরা আমলারা তো কোনটা গোপন রাখা উচিত আর উচিত না এটাই বুঝি না।'

একনাগাড়ে প্রায় পনেরো দিন অনুসন্ধান করে জানা যায়, জাতীয় ইএফএ ফোরাম কমিটির নামের তালিকা।

একটি কমিটি : অনেক প্রশ্ন

এনপিএ করার জন্য জাতীয় ইএফএ ফোরাম গঠিত হয় ১৮ জন সদস্যকে নিয়ে। এই ফোরাম বা কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা রাখে কিনা– তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের পাশাপাশি প্রশ্নও উঠছে। এই কমিটির প্রধান বা সভাপতি হলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা জাহানারা বেগম। সহসভাপতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব। বাকি সবাই এই কমিটির সদস্য। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) সদস্য সচিব। ১৮ জনের কমিটির ১১ জনই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা। এর বাইরে ৭ জন হলেন প্রফেসর ইরাজউদ্দিন আহমদ যিনি এক সময় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর সাইফ-উর-রহমান, গণস্বাস্থ্যের নির্বাহী পরিচালক ডা. জাফর উল্লাহ চৌধুরী, নিউজ টুডের সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমদ, প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার মনিরুল আলম, আহমদ নজির সাবেক সংসদ সদস্য এবং আশার ব্যবস্থাপনা পরিচালক সফিকুল হক চৌধুরী। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের ১১ আমলার বাইরে বাকি যে ৭ জনের কথা উল্লেখ করা হলো এদের কেউ কি শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিত। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, সফিকুল হক চৌধুরীরা এনজিও করেছেন সারা জীবন। তাদের কেউই বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছে বলে কারো জানা নেই। আবার সাংবাদিক রিয়াজউদ্দিন আহমদ কিংবা খন্দকার মনিরুল আলম কোনো কালে দেশের শিশুদের শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছেন তা সাংবাদিক মহলও জানে না। জানা যায়, কমিটিতে যাদের রাখা হয়েছে তারা মূলত বিএনপি ঘরানার লোক হিসেবে পরিচিত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষাবিদ বলেন, 'বিএনপি পন্থি শিক্ষকদের কি এতো অভাব পড়ে গেল। ড. এমাজউদ্দিন, মনিরুজ্জামান মিঞাদের মতো লোকদেরও যদি এই কমিটিতে রাখা হতো তাহলেও কোনো কথা উঠতো না। বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. সাইদ-উর-রহমানের নাম কোনো কালে শিক্ষাবিদ হিসেবে শুনিনি। এসব লোকের কথা আমলারা শুনবে বলে মনে করেন? আপনারা বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করি না।'

> 'এনপিএ'র সঙ্গে যথেষ্ট জনসম্পৃক্ততা ছিল না এটা বলা যায়। আপনারা জানেন, সরকারের পদ্ধতিগত কিছু জটিলতা আছে। তারা যখন ডাকার সম্মেলনে স্বাক্ষর করে এলো, তখনই তাদের ভাবা উচিত ছিল কিভাবে ব্যাপক জনসম্পৃক্ততার ভিত্তিতে এনপিএ করা হবে'
>
> **রওশন জাহান**
> শিক্ষাবিদ, লেখক, এনপিএ থিম পেপার

ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাশনের খসড়া একটি রিপোর্টের শুরুতে ডা. তাহমিনা হোসেনের নাম রয়েছে সচিব হিসেবে। ডা. তাহমিনা প্রাথমিক ও গণশিক্ষার সচিব। তিনি দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বা যে কোনো শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এরকম কথা কি কোনো কালে কেউ শুনেছেন? কবে নাগাদ রিপোর্ট জমা দেবে তার এখনও কোনো ঠিক নেই। শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য শিক্ষাবিদ বা ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এতো গোপনীয়তার মাঝেও দু'বছরে তারা প্ল্যান তৈরি করতে পারেনি। যদিও তা এ বছর মে'র মধ্যে সম্পন্ন করার কথা ছিলো। কবে করতে পারবে তারও ঠিক নেই। অন্তত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সুনির্দিষ্টভাবে কেউ কিছু বলতে পারেনি। এনপিএ তৈরি হলে এটা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি খাত থেকে অর্থ আসবে। খরচ হবে হাজার হাজার কোটি টাকা। যে বিষয় নিয়ে এতো অর্থ ব্যয় হবে

সেই বিষয়ে জানার অধিকার কি এ দেশের জনগণের নেই?

যেভাবে হয়েছে এনপিএ

এনপিএ কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটা একটা রহস্যময় ব্যাপারই বলা যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সবার জন্য শিক্ষা-২০১৫ এনপিএ তৈরির কাজ সম্পর্কে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এমনকি মন্ত্রণালয়ের অনেক কর্মকতাও এ বিষয়ে অবগত নয়। কিন্তু কিভাবে সম্পন্ন হচ্ছে এতো বড় একটা কর্মযজ্ঞ? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানার জন্য এনপিএ কমিটির সম্পাদক ডা. তাহমিনা হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য যতভাবে সম্ভব চেষ্টা করেছি। তার অফিসে যোগাযোগ করা হলে বলা হয়েছে– ম্যাডাম মিটিংয়ে আছেন, লাঞ্চে আছেন নতুবা একনেক মিটিংয়ে যাবেন- আরও অসংখ্য ধরনের অজুহাত দেখানো হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, মন্ত্রণালয় মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষানীতি বা পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বললেও তারা কোনো শিক্ষাবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। এনপিএ তৈরি কমিটির সদস্য যুগ্ম সচিব কাজী ফরিদ বলেন, 'ডাকার সম্মেলন অনুযায়ী আমরা কি করবো প্রথমে তা নির্ধারণ করবো বা করেছি। এজন্য আমরা আট-দশটি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা করেছি। এর ভিত্তিতে আমরা একজনকে একটি খসড়া লিখতে দিয়েছিলাম। সে সেটা লিখে দিয়েছিলো। তার ভিত্তিতে সাত-আটজন মিলে একটা প্ল্যান তৈরির চেষ্টা চলছে। এবং পুরো প্রক্রিয়াটি আমাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণে আছে।'

এ বিষয়ে এখনও কেউ তেমন কিছু জানে না কেন?

উত্তরে তিনি বলেন, 'এখনও তেমন প্রচার-প্রচারণায় আমরা যাইনি। পুরো কাজ হওয়ার পরে আমরা প্রচারণায় নামবো। তখন সবাই জানবে।'

কমিটিতে শিক্ষাবিদ নেই। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের লোকদের নিয়ে কাজ করছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'শুধু আন্তঃমন্ত্রণালয়ের লোক কমিটিতে থাকবে কেন? বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের লোক আছে, সাংবাদিক আছে। এক কথায় যারা এ ধরনের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা সবাই এখানে আছে।'

এ বিষয়ে আর কোনো কথা তিনি বলতে রাজি হননি।

সেমিনার-কর্মশালা ছাড়া আর কোনো পদ্ধতি অর্থাৎ সুশীল সমাজের মতামত শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণসহ একটি বিজ্ঞানসম্মত, মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য অন্য কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শিক্ষাবিদ বলেন, 'জনসম্পৃক্ততাহীন আমলারা মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এই পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে, এটা কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন? অতীতে আমলারা কি করেছে সেটা আমরা জানি। এ দেশের জনগণও জানে। আট-দশটি কর্মশালার ওপর নির্ভর করে দশ-বারো বছরের জন্য একটা প্ল্যান করবে সেই প্ল্যান দিয়ে বড় জোর ৬ মাস বা ১ বছর চলতে পারে, একযুগ নয়।'

এনপিএ'র থিম পেপার

এরপর আরো কয়েকদিন অনুসন্ধান করে জানা যায়, এনপিএ'র থিম পেপার লেখার জন্য আট জনের একটি কমিটি আছে। অনেক চেষ্টার পর এই কমিটির সাত জনের নাম আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। অন্য একজনের নাম শেষ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। এই নামটি জানার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সব কয়টি স্থানে একাধিকবার ধরনা দিয়েছি।

জানা যায়, ২০০১ সালের মে মাসের মধ্যে শিক্ষাবীদদের থিম পেপার জমা দেয়ার জন্য বলা হয়। তারা ঐ সময়ের মধ্যে পুর্বানী হোটেলের এক কর্মশালায় পেপারের আউটলাইন দেন, আগস্টের মধ্যে সবাই রিপোর্ট জমা দিয়েছেন বলে জানা যায়।

এনপিএ'র জন্য একটি পেপার লিখেছিলেন রওশন জাহান। তিনি বলেন, 'আমাদের বলা হল মে'র মধ্যে পেপার জমা

জাতীয় ইএফএ ফোরাম কমিটি

১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা	সভাপতি
২.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	সহ-সভাপতি
৩.	সচিব/যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সচিব/ যুগ্ম-সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সচিব/যুগ্ম-সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সচিব/যুগ্ম-সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট	সদস্য
১০.	উপ-প্রধান, পরিকল্পনা কোষ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১১.	প্রফেসর ড. ইরাজ উদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, শিক্ষাবিদ	সদস্য
১২.	প্রফেসর ড. সাইদ-উর-রহমান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবিদ	সদস্য
১৩.	ড. জাফর উল্লাহ চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাস্থ্য	সদস্য
১৪.	জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, সম্পাদক, দি ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকা, সাংবাদিক	সদস্য
১৫.	খন্দকার মনিরুল আলম, সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব	সদস্য
১৬.	জনাব আহমদ নজির, সাবেক সংসদ সদস্য	সদস্য
১৭.	জনাব মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আশা	সদস্য
১৮.	যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	সদস্য-সচিব

দেখা যাচ্ছে কমিটির প্রায় সবাই আন্তঃমন্ত্রণালয়ের লোকজন। কমিটিতে অবশ্য বিএনপি পন্থি দু'জন সাংবাদিকও আছেন। এদের একজন নিউজ টুডের সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ও অপরজন প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার মনিরুল আলম। ঘটনা যাই হোক, যে কোনো কারণেই হোক আমলারা বিষয়টি গোপন করেছেন। শিক্ষাবিদদের অন্ধকারে রেখে তারাই একটা শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন। আমলারা শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে কি না? করলে সেটা যুগোপযোগী হবে কি না– সে সম্পর্কেও অনেক ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। পাশাপাশি এমন অভিযোগও শোনা যাচ্ছে, মানসম্পন্ন শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ইউনেস্কো যে পরামর্শ দিয়েছে তার অনেক কিছুই মানা হচ্ছে না এনপিএ রিপোর্টে। যদিও এনপিএ তৈরির জন্য ইউনেস্কো ২২ হাজার ডলার দিচ্ছে। এনপিএ তৈরিতে শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভুক্ত করলে এই ২২ হাজার ডলার কীভাবে খরচ হবে– সে বিষয়টিও সামনে চলে আসতো। এনপিএ রিপোর্টের মতো এই ডলার খরচের বিষয়টি আমলারা গোপন রাখতে চায়। শিক্ষাবিদদের না জানিয়ে এনপিএ রিপোর্ট গোপনে তৈরি করার ক্ষেত্রে এই ২২ হাজার ডলারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে জানা যায়। অবশ্য অন্য একটি সূত্র থেকে জানা গেছে. এই কমিটিতে আরো কয়েকবার রদবদল ঘটেছে। অনেক চেষ্টা করেও জানা যায়নি, পূর্বে আসলে কারা এই কমিটিতে ছিলেন।

দিতে। আমরা প্রত্যেকে পেপার তৈরি করলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশন করা সম্ভব হয়নি।'

জানা যায় এই ৮টি থিম পেপারের ওপর ভিত্তি করে ছোট ছোট কর্মশালা করা হয়। এসব কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন অধিকাংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আর কিছু এনজিও প্রতিনিধি। ছোট ছোট কয়েকটি কর্মশালা করার কারণ হল এনপিএতে জনগণের অংশীদারিত্বের ব্যাপারটা প্রমাণ করা। রওশন জাহান বলেন, 'আমরা লিখিত দিয়েছি যে এটা জনগণের অংশীদারিত্বমূলক হচ্ছে না। সরকার আমাদের কথায় কান দেয়নি।' রওশন জাহানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এনপিএ একটা বিরাট ব্যাপার, এর জন্য ইউনোস্কোর গাইড লাইন ছিল তারপরও এত গোপনে করা হচ্ছে কেন? দেশের শিক্ষাবীদরাও তো অন্ধকারে আছেন। উত্তরে রওশন জাহান বলেন, 'এনপিএ'র সঙ্গে যথেষ্ট জনসম্পৃক্ততা ছিল না এটা বলা যায়। আপনারা জানেন, সরকারের পদ্ধতিগত কিছু জটিলতা আছে। তারা যখন ডাকার সম্মেলনে স্বাক্ষর করে এলো, তখনই তাদের ভাবা উচিত ছিল কিভাবে ব্যাপক জনসম্পৃক্ততার ভিত্তিতে এনপিএ করা হবে। তারা তা ভাবেনি। আমরা যে পেপার লিখেছি এবং যে ড্রাফট হচ্ছে সেখানে ইউনেস্কোর গাইড লাইন মোটামুটি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এটা বাস্তবায়ন হবে কিভাবে? এনপিএ বাস্তবায়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থায়ন দরকার হবে তা আমাদের নেই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ব্যাপারটা নেই। জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করা গেলে ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী আগানো সম্ভব। আমি যতদূর জানি ২০১০ সাল পর্যন্ত জিডিপির ৪.৫ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় হবে। ডাকারে আমরা বললাম মানসম্মত শিক্ষা দেবো। কিন্তু সেটা হচ্ছে না, কারণ এর জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আবার জাতীয় পর্যায়ে এনপিএ হচ্ছে কিন্তু বাস্তবায়িত হবে স্থানীয় পর্যায়ে। যে শিক্ষক শিক্ষা দেবেন তাদের অবস্থা ভয়াবহ খারাপ। আসলে পিটিআইয়ের অবস্থা এত খারাপ যে সেখান থেকে যে শিক্ষক বেরোবে তার পক্ষে ডাকার সম্মেলন অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। কোনো কালেই সম্ভব নয়। দেখেন এরকম অসংখ্য সমস্যা আছে। তো আমার কথা হলো, তৃণমূল পর্যায়ে আরও বেশি মানুষের সম্পৃক্ততা থাকা উচিত ছিল। সেটা করা যায়নি। জমতিয়েনের পরেও কিন্তু হয়নি। প্ল্যান কি হলো তার চেয়ে আমার ধারণা কর্মপদ্ধতির ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া নজরদারি, জবাবদিহিতা সকল পর্যায়ে করতে হবে। তবেই না লক্ষ্য পূরণের প্রশ্ন আসবে।'

মাহামুদুল আলম একটি থিম পেপার লিখেছেন। মাহামুদুল ইসলামও স্বীকার করেন জনসম্পৃক্ততার অভাব ছিল। তিনি বলেন, 'আমরা যেভাবে চাই সেভাবে জনগণের অংশগ্রহণ হয়নি। আমরা সরকারকে বলেছি, সরকার রাজি হয়নি। তাদের রাজি না হওয়ার পেছনের কারণগুলো হাস্যকর। অনেক লোকের সম্পৃক্ততাকে আমলারা ঝামেলা মনে করে। তার কারণ দেখায় অনেক খরচাপাতির ব্যাপার ইত্যাদি। তাদের বললাম কোনো খরচ হবে না, সবকিছু আমরা করবো। তারপরও তারা রাজি হলো না। আসলে কি আমলারা চায় না যে কোনো কাজেই অনেক ধরনের মানুষের সম্পৃক্ততা থাকুক। এই আমলারা যদি মানুষের মনোভাব বুঝতে পারতো তবেই চলতো। আমরা বারবার বলেছি জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করতে। তারা বারবারই তা এড়িয়ে গেছে।'

> 'এরকম একটা প্ল্যান হচ্ছে শুনেছি। এর বেশি কিছু আমি জানি না। আসলে সরকার যদি আমাদের না ডাকে তাহলে তো আমাদের সেখানে যাওয়ার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে আমার গবেষণা আছে কিন্তু এনপিএ যারা তৈরি করছে তারা আমার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি'
>
> **অধ্যাপক জাহেদা বেগম**
> শিক্ষাবিদ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুসন্ধানে জানা যায়, সব মিলিয়ে তিন-চারটি কর্মশালা হয়েছে। কর্মশালাগুলোতে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল খুবই কম। থিম পেপার যারা লিখেছেন তারা বলার পরও মন্ত্রণালয় কেন ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করলো না সেটার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ের এই গোপনীয়তা, শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ সবকিছুর পেছনের প্রধান ব্যক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড. দেলোয়ার হোসেন। নাম না প্রকাশের শর্তে একজন বিশেষজ্ঞ যিনি টেকনিক্যাল কমিটিতে আছেন তিনি বলেন, 'সত্যি বলতে কি, সবকিছুর মূলে হলো ঐ ড. দেলোয়ার হোসেন। এই এত কমিটি, কর্মশালা, বিশেষজ্ঞ ও গোপনীয়তা নিয়ে বিতর্ক এগুলো সবই মূল্যহীন। চূড়ান্ত রিপোর্টের কাটাছেড়া, বিশেষজ্ঞ মতামত সব সে একা করবে। এরশাদ আমল থেকে সব সরকারের সময় হালুয়া রুটি খাচ্ছেন তিনি। তিনি যেটা ভালো মনে করেন সেটাই করবেন।'

যাদের থিম পেপারের ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক শিক্ষার কর্মপরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে তারাও বলছে জনসম্পৃক্তা না থাকার কথা। দেশের শিক্ষাবিদ, সাধারণ মানুষকে সবকিছু গোপন করতে চান ড. দেলোয়াররা। কারণ নিজেদের স্বার্থ, দেশের নয়। যে সমাজ, রাষ্ট্রের জন্য এনপিএ, সেই সমাজের প্রতিনিধিদের বাইরে রেখে শিক্ষার পরিকল্পনা কতটা সফল হবে এটা একটা বড় প্রশ্ন। অনেকে মনে করেন, এখনই এনপিএর কাজ বন্ধ করে আবার নতুন করে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করা উচিত। পাশাপাশি ড. দেলোয়ার হোসেনের মতো সর্বজ্ঞানী আমলা আর ডা. তাহমিনা হোসেনের মতো চিকিৎসকের শিক্ষার মহপরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা না থাকাই দেশের জন্য মঙ্গলজনক। প্রয়োজন সব ধরনের শিক্ষাবিদ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। তবেই সফল হবে শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য।

কীভাবে বাস্তবায়িত হবে এনপিএ

সবার জন্য শিক্ষার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে কীভাবে? বিষয়টি জানার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা অধ্যাপক জাহানারা বেগমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, কথাও হয় তার সঙ্গে। তিনি তার এপিএস আব্দুল মুকিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা সময় নিতে বলেন কথা বলার জন্য। ১৮ আগস্ট সময়ও দেন। কিন্তু ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত কথা বলতে রাজি হননি জাহানারা বেগম। ফলে এনপিএর ভবিষ্যৎ, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং এনপিএ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। এনপিএ'র বাস্তবায়ন হবে কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডা. তাহমিনা হোসেন বলেন, 'এখনই বাস্তবায়নের প্রশ্ন আসছে কেন? এনপিএ তো এখনও তৈরি হয়নি। আগে তৈরি হোক, তারপর আসবে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ।' এ কথা বলে তিনি ফোন রেখে দেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব রীনা পারভীন। যিনি সবার জন্য শিক্ষা ডেস্কের দায়িত্বে আছেন। তিনি বলেন, 'এনপিএ বাস্তবায়ন হবে কিভাবে তা এখন কেমন করে বলবো? এটা তো আমি বলতে পারবো না। একেক কর্মসূচি একেকভাবে পালন করা হবে।' পরে কথা বলবেন বলে তিনিও ফোন রেখে দেন।

একটা কর্মপরিকল্পনা হচ্ছে অথচ তার বাস্তবায়নের ধারণাটি সরকারি পর্যায়ে অস্বচ্ছই বলা যায়। কেউই বলতে পারছে না বাস্তবায়নের প্রসঙ্গটি। এনপিএ তৈরি করার প্রক্রিয়াটি যেমন অস্বচ্ছ, তেমনি বাস্তবায়ন বা পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা আরো বেশি অস্বচ্ছ।